পঞ্চম অধ্যায়

‘বোকা কাশীরাম কথা’ থেকে ‘শিকড়ের সন্ধানে’ : গল্পকথার সাজ

রণবীর পুরকায়স্থের প্রথম গল্প সংকলন হল ‘বোকা কাশীরাম কথা’। এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। এই গল্প সংকলনে গল্পগুলিকে বা কথাক্রম অনুসারে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন গল্পকার। এই তিনটি বিভাগের প্রথম হল— মিনির হাসি, দ্বিতীয় হল— ফুলমালার সংসার, তৃতীয় হল— মতমানুষ কথা। এই গল্প সংকলনের প্রথম গল্প ‘মিনির হাসি’। এই গল্পটি ‘শতক্রতু’ পত্রিকায় ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘মিনির হাসি’ গল্পটি শুরু হয়েছে এই ভাবে— ‘‘আমার সাগর দেখা কৌতূহলেও মিনি হেসেছিল। ও খুব জোরে হাসে না, ওর চোখের মণি দুটো শুধু এপাশ ওপাশ করে। কখনও একটা ঠোঁট ভাঙে, কখনও দুটোতে চাপ দেয় শক্ত করে, কখনও নিচেরটাকে উপরে উঠিয়ে আলতো চেপে রাখে। এরকম অনেক নীরব ভঙ্গি আছে ওর হাসির। মিনির চশমার চৌকা ফ্রেমটাও ওর চোখ দুটোকে আরো রহস্যময়ী করে তোলে। মিনির রহস্যময়তা আমাকে বিব্রত করে।’’[১] এই গল্পটি উত্তমপুরুষে রচিত। গল্পকথক ঝড়বৃষ্টির দিনে সমস্যায় পড়ে মিনির সঙ্গে মস্‌করা করছেন। মিনি কথকের সব বিষয়েরই হাসেন। হাসির মধ্যে দিয়ে তার সব বিষয়ে অর্থ বুঝিয়ে দেন। গল্পকথকের ইচ্ছে হল সমুদ্র দেখা। প্রত্যেকেই জীবনে কোনো নতুন কিছু দেখার সময় কৌতূহল হয়ে পড়েন তার গল্পকথকের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে। মিনি চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে মোটামুটি ভাবে সব কিছুই তার জানা। কিন্তু গল্পকথক অনেক বিষয়ে মিনির কাছ থেকে জানতে হয়েছে।

'বোকা কাশীরাম কথা' গল্প সংকলনের দ্বিতীয় গল্প 'রঞ্জন আসছে'। এই গল্পটি 'শতক্রতু' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি একটি প্রেমের গল্প। বাবু অনেক দিন পর স্বীতার সঙ্গে বসে কথা বলে আনন্দ পাচ্ছে এবং পূর্ব স্মৃতির জন্য দুঃখও করছে। স্বাতীকে আজ নতুন করে দেখছে, তার মনে হচ্ছে ব্যবিলনের রাণী। বাবু কিন্তু মিনিকে প্রেম করে বিবাহ করেছে। তা সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে মিল হচ্ছে না। মিনি বাবুকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। কারণ হল স্বাতীর সঙ্গে আড্ডা দিত। আর এই খবর যে মিনি জানতো তা ভাবতেও পাড়তো না বাবু। তাই বাবু মিনিকে ভালোবাসলেও সেই ভালোবাসা মিনির কাছে কৃত্রিম বলে মনে হতো। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি শেষ হল তখন দু'জনেই নিজে নিজেকে দোষী মনে করেন। রঞ্জন আসবে কলকাতা থেকে মিনিদের বাড়িতে। এই রঞ্জন হেতুপদ হিসেবে কাজ করেছে বাবু ও মিনির মিলনের ক্ষেত্রে। তাই এই গল্পের নামকরণ হল 'রঞ্জন আসছে'।

রণবীর পুরকায়স্থের তৃতীয় গল্প সংকলন হল 'আসমান জমিন কথা' ২০১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্প সংকলনের মধ্যে বারোটি গল্প আছে। এই গল্প সংকলনের দ্বাদশ গল্পটি হল 'আসমান জমিন কথা' ঈশান বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি শুরু হয়েছে— ''তোমার জন্য সবুজ মতো একটা সকাল রাখতে চাই। মনের তারে বাজে এক মোহময়ী সুরের জাদু। আকাশে কে যেন উলটো করে উঠিয়ে দিয়েছে গানের রং।''[২] সুন্দরকে ধরতে গিয়ে সপ্তাশ্ব তার গতির কৃত্রিমতাকে লাগাম দেন। দৃশ্যমান সুন্দরকে কুর্নিস জানিয়ে তিনি এক তারায় সুর তোলেন। তিনি একটি বাউল কবির গান গায়— 'মন আখি হতে পয়দা আসমান জমিন'। সপ্তাশ্ব অবশ্য এই চা বাগানের কুর্মি জাতির মেয়ে শাখীকে মনে মনে ভালোবাসে। তাই তার চোখে শাখী কখনো 'নীলমণি' কখনো 'কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা'। কখনো তার কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের গান গায়— 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ'। আবার কখনো মনে হয়েছে তার 'দুর্গা', কখনো 'সুখ পাখি'।

সপ্তাশ্ব হল ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। সে বিবাহ করেছে রমা মিশ্রকে। আর সপ্তাশ্ব শহরে গিয়ে শহুরে কায়দায় কথা বলা শিখেছে। লেখক জানিয়েছেন 'কথায় আছে শতেক বাণী, যদি কথা কইতে জানি'। শাখী সম্পর্কে তখন সপ্তাশ্বের মনে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইন— 'নহ মাতা, কহ কন্যা, নব বধূ সুন্দরী রূপসী'। অথচ এই শাখীকে সপ্তাশ্ব বলে দুই সন্তানের বাবা অমরজিৎকে বিয়ে করতে। সপ্তাশ্ব বলে— ''বাইচ্চা দুটাও তা তর জানর টুকরা! তরে কে দেখব ক চাইন? অউও তর গার্জিয়ান দুখু তার অউ লেংটির ঠিক নাই তুই তর চাকরি করবে, খাইবে, বাইচ্চা মানুষ করবে, তর একটা পরিচয় অইব। সামাজিক পরিচয় দরকার।''[৩] সপ্তাশ্বরের কাছে এই কথা শুনে অরণ্যকন্যা দুঃখে কাঁদতে থাকে। শাখীও তাকে অভিমানে বলে—

''আমার লাগি কেউর ভাবন লাগত নায়।

— আমি তুমরার বুঝা অই গেছি, নানি?''[৪]

তাই আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনকে কিন্তু পোস্টমাস্টারের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু কলকাতাবাসী পোস্টমাস্টার তাকে নেয়নি। পোস্টমাস্টার চলে আসার সময় রতনকে অর্থ দিতে গেলে, রতন পোস্টমাস্টারের পা জড়িয়ে ধরে বলে আমার জন্য কারও কিছু ভাবতে হবে না, আমাকে কিছু দিতে হবে না এবং এক দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু রণবীর পুরকায়স্থ তার 'আসমান জমিন কথা' গল্পে সপ্তাশ্ব শাখীকে গ্রহণ করতে চাইলেও শাখী তাতে রাজী নয়। কারণ সে যদি সত্যিকারে ভালোবাসতো তাহলে অনেক আগেই বিয়ে করতো। সে হাইলাকান্দির মেয়ে রমা মিশ্রকে বিয়ে করেছে এবং

তাদের একটি ছেলে সন্তানও হয়েছে। অমরজিৎ নুনিয়ার পত্নী নেই তাই তাকে বিবাহ করেছে শাখী। এতে শাখী প্রমাণ করে দিয়েছেন শাখী তার হাতের পুতুল নয়। শাখীরও নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, আছে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা। তাই দেখা যায়— ''যে ছিল তার হাতের পুতুল, যে ছিল তার কাদার তাল, যাকে শৈশব থেকে নিজের মতো চালনা করে এসেছে, সে হঠাৎ করে এত বল কোথায় পায়।''[৫] সপ্তাশ্বরের মতো চরিত্ররা সম্পর্ক বজায় রাখে নিজের প্রয়োজনে, ভাগ সর্বস্বতার জন্য।

রণবীর পুরকায়স্থ তার ছোটগল্প রচনায় মান্য বাংলা ভাষার মাঝে মাঝে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করেছেন। তাই পাঠক হিসেবে আমাদের মনে হয় ছোটগল্পে এই উপভাষার মধ্যে দিয়ে একেবারে বাস্তবের মূল বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় করিয়ে দেন। 'আসমান জমিন কথা' গল্পে ব্রাহ্মণ অশ্বিনী কবিরাজের সঙ্গে লখিন্দর কুর্মির আলাপে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। অশ্বিনী কবিরাজ ও লাখিন্দর বলেন—

''— কিতা বে, দক্ষিণা নি?

— অয় জেঠামশায়।

— তর পুয়ার নাম কিতা রাখছচ তে?

— অখনও রাখছি না আইজ্ঞা, আপ্‌নে দিলাইন নাম। আমি ভাবছিলাম দুখু, তার মারে বহুত দুখ দিচ্ছে আইজ্ঞা।

— বালা অউও। দুখু রাখি দে ডাক নাম। ইস্কুলো উস্কুলো পড়াইবে নানি। বালা নাম রাখি দে একটা।

— আপনে দিলাইন। তলবে দিনে দিয়া আইমুনে আবার পাচ সিকা?

— দুরবে, তর লগে নি দক্ষিণার সম্পর্ক। তর পুয়া আইছে, অউ আমরার আনন্দ। তর জেঠিমায় দেখিছ কততা লই আইয়। নতুন কাথা জামা জুমা বউত্তা, আর আমি এক বকা বাবন দেখ খালিহাতো আইছি। নে একটা নামঅউ দিয়া যাই। তর পুয়ার নাম রাখিছ দক্ষিণা। দক্ষিণারঞ্জন কুর্মি।"[৬] অপর ভুবনের বাংলা ভাষাভাষি মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করিয়ে দেয়। এই আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে দিয়ে তাদের অন্তরের কথা স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠে।

ভাষা হল সাহিত্যে রচনার মূল অস্ত্র। ভাষাকে সাহিত্যিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, ভাষাকে ভেঙে ও ভাষাকে পূর্ণবিন্যাস করেও বিনির্মাণ করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। কথাসাহিত্য সাহিত্যিক তার সাহিত্যে নিজের অনুভূতি ধারণ করেন এবং তার শিল্প সাহিত্যে কিছু নতুনত্ব দান করেন। কিন্তু সেই নতুনত্ব আবার যতই নতুন হোক তা বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে কখনই পারে না। সব সময় শিল্পী কিন্তু বাস্তবকে গ্রহণ করেই সাহিত্য রচনা করেন, রণবীর পুরকায়স্থ তার ব্যতিক্রম নয়। সে দিক থেকে বলতে গেলে বাংলাদেশ, কলকাতা ও বরাক উপত্যকার লেখকেরা তাদের রচনায় ভাষার মাধ্যমে বাস্তব অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। আরেকটি দিক হল প্রত্যেক স্থানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক আলাদা। কিন্তু আলাদা হলেও সেই সব স্থানের বাস্তব রূপই ফুটে উঠেছে তাদের রচনায়। অসাধারণ শব্দ চিত্রে তিনি ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন সে সময়ের ও সে অঞ্চলের প্রকৃত মানসিকতাকে। সেই অঞ্চলের মানুষের অন্ধকার প্রকোষ্টে তিনি নিক্ষেপ করেছেন আলোর মশাল। তিনি সময়ের স্বর ও অন্তঃস্বরের দ্বিবাচনিকতা তুলে ধরেছেন তার গল্পে। আখ্যানের গভীরে অন্তঃস্বর তাই পাঠককে আকর্ষণ করে। তাই কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য হল— "যে কোনো আখ্যানের মূল দায়িত্ব হল এক বা একাধিক স্পেস এ পাঠকদের চালিত

করা। সময় সম্পর্কেও একই কথা। সব আখ্যানই অতীতের। কিন্তু পাঠকের কাছে তা বর্তমান হয়ে যায়।"[৭] ছোটগল্পকে বলতে পারি জীবন নির্ভর, এতে জীবনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বলতে গেলে আদিম যুগ থেকে মানুষ আবিষ্কার করে আসছে জীবনের সন্ধান। মানুষ আজ বেঁচে থাকার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে চেয়েছে প্রতিটিক্ষণের তাৎপর্য। আর সাহিত্য লেখকরা এই মানব চেতনা উপলব্ধি করতে চান। ছোটগল্পও জীবনকে অবলম্বন করে দেখা হলেও তা কোন নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা জীবন বলা যাবে না। এই জীবনের পরিসর অনেক বড়, তাতে থাকে ভালো মন্দ মানুষের জীবন, তাই লেখক তার সাহিত্যে তুলে ধরেন। লেখক জীবন ও জগৎকে দেখেছেন এবং জীবনের সমস্যাগুলিকে সমাধানের ইঙ্গিত করে যান তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় লেখকের জীবন দর্শন। লেখক যেমন সমাজের বাস্তবকে দেখেন তেমনি আপন প্রভাবে সাহিত্য রচনা করেন। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের লড়াই ঘটে কখনো একক ভাবে কখনো আবার যৌথভাবে। আর এই ব্যক্তিই হল লেখকের হাতিয়ার। গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ বরাক উপত্যকায় এক পরিবর্তনশীল সময়ের রূপকার বলা যেতে পারে। সৃষ্টির দিক থেকে সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেননি। তিনি একজন গভীর অনুভূতিশীল লেখক।

ভাষার প্রধান কাজ হল মনের ভাব প্রকাশের সাহায্য করে। কারণ মনের অন্তঃপুরের জন্মানো ভাব ভাষাকে আশ্রয় করে সাহিত্যে তা প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সাহিত্যকে যদি বিশিষ্ট করে তুলতে হয় তাহলে তাকে বিশেষ রূপে গড়তে হয়। তাই রণবীর পুরকায়স্থ তার গল্পগুলিকে বিশেষ বা ফর্মে গড়েছেন। অবশ্য রচনারীতি বা শৈলী ব্যক্তি বিশেষ বদল হয়। কারণ প্রতিটি লেখক তার সাহিত্যে নিজস্ব কলাকৌশল প্রয়োগ করেন। সেই জন্যই একজন লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। তাতেই ধরা পরে কোন রচয়িতা সে পুরুষ না নারী। তিনি সাধারণ মাপের না অসাধারণ মাপের তার মানসচিত্রও ফুটে উঠে

তার রচিত সাহিত্যে ও তার বক্তব্যে। সহজ কথায় বলা যায় তার সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। তাই পাশ্চাত্য শৈলী বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ পর্যায় ফরাসি বিজ্ঞানী আঁরিবুফোঁ বলেছিলেন "Style is the man himself ..."। এই শৈলীর সঙ্গে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের নিবিড় যোগাযোগ আছে। রণবীর পুরকায়স্থের অসাধ্য গল্প বাঙালির মধ্যবিত্ত সমাজের চিহ্নায়ক। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সৃষ্টির প্রতিভার নিদর্শন হিসেবেই পরিচিত নয়, এদের মান্যতা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রমান্য দলিলও কথা যায়।

জীবনের প্রত্যেক স্তরে স্তরে নানা গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক কাহিনির উপকরণ প্রতিদিন অন্য সব উপাদানের সঙ্গে অন্বয় ও অনন্বয়ে নতুন নতুন সংরূপ তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটি জীবন প্রবাহ কত যে হাসি-কান্না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সরল জটিল নিয়ে বয়ে চলেছে তার হিসেব নেই। দেখা যায় কখনও তার গতি স্থির, কখনও দ্রুত আবার এও দেখা যায় নতুন করে শুরু হয় নতুন আবর্ত্য। প্রতিদিন আমরা এই পরিচিত পৃথিবীতে যাদের দেখেছি তাদের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে গল্পের কাহিনি। আমরা একটু কল্পনার সাহায্য নিলেই এই তথ্য থেকে গল্পের কাহিনিতে আসা যায় কথা সাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থের লেখা যে শুরু হল আজও তার জীবন খনন অব্যাহত রয়েছে। তিনি সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তার অবাধ বিচরণ করেন। চলমান জীবনকে নানা ছবি থেকে নানা আঙ্গিক নানা তাৎপর্যে দেখেছেন। তিনি সবসময় তার গল্পের ভাষণ বা গল্পবীক্ষা করেছেন অভিনিবেশ ও আন্তরিকতা দিয়ে প্রকরণে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সবসময় সচেতন ছিলেন। তিনি যতটা সম্ভব পাঠকের কাছে লুকোচুরি খেলেছেন। বছরের পর বছর আমাদের চেনা পৃথিবীর মধ্যে কত যে বিকট বিভৎস অচেনা মরুপ্রান্ত ও জঙ্গলের স্তুপে পরিণত হয়েছে তার হিসেব নেই। একুশ শতকে তিনি মানুষ মানবীয় চিরায়ত কাহিনি রচনা করেছেন।

বরাক উপত্যকায় বাংলা গল্প রচনার উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। 'শতক্রতু' পত্রিকা। তার মূলে রয়েছে বাংলা ভাষা ও ভাবের দুরন্ত আধুনিকতা। তবে ছোটগল্পগুলির দেহশয্যায় অর্থাৎ আঙ্গিকে বিচিত্র ও বহুমুখি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রচলিত গল্পের ধারাবাহিকতা দিন দিন বদল হয়েছে। বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্যে আসড়ে কয়েকজন অঙ্গুলিমেয় লেখক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন, তাদের মধ্যে রণবীর পুরকায়স্থ একজন উল্লেখযোগ্য। তিনি 'অনিশ' পত্রিকায় গল্প প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্প জীবনের প্রতি অনুভূতিও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রতিটি গল্পের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের অস্তিত্ব খুঁজেছেন।

রণবীর পুরকায়স্থের 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা' গল্প সংকলনের কথা প্রসঙ্গে পর্বের প্রথম গল্প 'নৌকাবিলাস', এই গল্পটি আকারে ছোট হলেও এর মধ্যে একটি নতুন অনুভূতির সাড়া জাগায়। শসীম আহমেদ হলো মুসলমান যুবক ও শৈলজা চক্রবর্তী হলো হিন্দু ব্রাহ্মণ যুবতী। তারা একে অপরকে ভালোবাসে। যখন তাদের প্রেমের সম্পর্ক গভীর হলো, তখনই দেখা দিল খটকা। তাদের মনে হলো ধর্মের কথা। উভয়েই চায় অপরকে ধর্মান্তরিকরণ করতে। কেউ কারো ধর্ম ছাড়তে চায় না। কিন্তু শসীম ভালোবাসাকে জয়ী করার জন্য ধর্মান্তরিত হতে চেয়েছিল কিন্তু সম্ভব হলো না। শসীম বলে, — ''আজি পালটাবো না। হিন্দুরা নেবে?'' হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হতে পারে, তা অন্য ধর্মের লোক সাদরে গ্রহণ করে কিন্তু অন্য ধর্মের লোক হিন্দু ধর্মে আসতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্র এ পর্যন্ত এই রাস্তাটি এখনও আবিষ্কার করেনি। শৈলজা চক্রবর্তী মুসলমান ধর্মে আসলে তাকে নতুন নাম দেবে লুৎফা। শৈলজাও শসীমকে মায়াপুর থেকে শঙ্খ মহারাজ হয়ে ফিরে আসতে বলে, ''সঠিক সময়ে দুই বেঠিক নারী পুরুষ খাবার ঘরের গোল টেবিলে মুখমুখী বসে থাকে অবাক জলপাত্র হাতে। গৌরবর্ণ গৈরিক বসনের মুণ্ডিত মস্তক পুরুষে তাকিয়ে হতবম্ভ নারী গায়ে উল্টো পদাবলী ঢলঢল কাঁচা

অঙ্গের লাবণি পুরুষ দেখে বরবর্ণিনী হরিণ-নয়নের চকিত চাহনি। ময়ূররঙা অপরূপ বোরখাবাসের শারীরী আমন্ত্রণে পুরুষ হৃদয়ও বিহ্বল।"[৮] গল্পকার তার ছোটগল্পে ছোট ছোট লাইনের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। ভাষা ব্যবহার করেছেন মান্য চলিত ভাষায়। তিনি মান্য চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন ঠিকই তবুও দেখা যায় ভাষার মধ্যে কোথাও কৌশল প্রয়োগ করেছেন। ''তখন অকূলে পাড়ি দেওয়ার আগে নকল নামের বাদামখানি ওরা হেলাভরে ফেলে দেয় জলে।"[৯] লুৎফা ও সঙ্ঘ মহারাজ এই নকল নাম দুটি বিসর্জন দিয়ে তারা তাদের প্রেমকে জয়ী করতে চেয়েছে। তারা সমাজকে জানিয়ে দিয়েছে ''আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব আবহমান কাল।"[১০]

'সাদাসিধে' গল্পে দেখা যায় একজন সাদাসিধে ব্যক্তি সরকারি আধিকারীক তাকে অনেকেই মান্য করে। তিনি সবসময়ই নিয়ম মাফিক অত্যন্ত ভদ্রলোক। আবার কিছু লেখক আছে তাকে আড়াল থেকে গালি দেয়। ''এঁড়ে চড়ালকে ওঠাবে কে? নিয়ম নীতির এত ছুৎমার্গ থাকলে পদোন্নতি হয় না। ধোয়া বাসিল পাতায় ব্যটা চন্দনের টিকে।"[১১] সাদা সিধে ব্যক্তিটি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার দিনে অহিভূষণ ও বিধুভূষণ বিদায়ের সম্বর্ধনা করেন। বিদায়ের দিনে তাকে কিছু না বলে সবাই চলে গিয়ে কিছুক্ষণ বিব্রত করে। কিন্তু আবার তারা এসে বিদায় সম্বর্ধনা জানায়। বিদায় জানার সময় তারা সবাই গান করে ''হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ স্যার"। এই গল্পে লেখক সংখ্যাযুক্ত করে পরিচ্ছেদ ভাগ করেছেন। পরিচ্ছেদগুলি ছোট ছোট আকারের এবং চরিত্ররা অনেক সময়ই সংলাপের মাধ্যমে কথা বলেছে। মান্য চলিত ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষারও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বয়স বাধা আছে আটান্ন। যতক্ষণ কাজ চলেগা চাকরিও চলেগা। আসি যাই বেতন পাই ওভারটাইমে করে খাই নাই চলেগা। এই মিশ্রণের ফলে গল্পের ভাষায় এক নতুন মাধুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই পাঠককে বুঝতে ও পড়তে আগ্রহী করে তোলে।

ভাষা হলো সাহিত্য রচয়িতার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। লেখক শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তুলে ধরে তার শিল্প সৃষ্টি। আর এই ভাষার সঙ্গে জড়িত থাকে লেখকের জীবন বিষয়ক কথা। এক কথায় বলা যায় তার জীবন সৃষ্টি। গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থের গল্পগুলি হলো বিষয়ানুসারী। তার গল্পের কাহিনি চরিত্র পরিবেশ ইত্যাদি উপকরণের সব শিল্প হলো তার ভাষা কৌশল।

রণবীর পুরকায়স্থের রচিত 'খোঁজে লীলাবতী' গল্পটি 'বোকা কাশীরাম কথা' সংকলনের অন্তর্গত। ভাস্করানন্দ শর্মা চিঠি পাঠিয়েছেন প্রিয় ফুলদার কাছে, যেন তার জন্য সাদা লঙ্কার বীজ বা চাড়া পাঠান। কারণ তিনি ছাদে গাছ লাগিয়েছেন সবগুলিই ফুলের টবে একটিই ব্যতিক্রম। তার সঙ্গে এও জানিয়েছেন স্ত্রী লীলাবতী ভালো আছে; ছেলে মিহিরের কাছে গিয়েছিল।

ভাস্করানন্দ শর্মার পিতা ছিলেন ভৃগুচরণ শর্মা। ভৃগুচরণ শর্মা ছিলেন বিহারের টুলো পণ্ডিত। তার কাছে নানা স্থান থেকে লোক আসতো তাবিজ নিতে। এই রকম পিতার সন্তান হওয়ায় ভাস্করানন্দ শর্মা গর্বিত। তিনিও বুজরুকি করেন, তার স্ত্রী লীলাবতী এই কাজকে সমর্থন করেন না। এই ব্যবসায় ভাস্করের প্রচুর অর্থ উপার্জন হতো, কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক জায়গায় তার খটকা লাগে। তাই ভাস্করানন্দ শর্মা বলেন— ''সাদা লঙ্কা আমার সততার প্রতীক। তান্ত্রিক জ্যোতিষি যে সর্ব শক্তিমান নয় সে কথাটিরও জানানো প্রয়োজন। তাই মাঝে মাঝে না করে দিই।''[১২] কিন্তু সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই তান্ত্রিক অনেক শক্তিমান। তাই মাঝে মাঝে দেখা যায় ভাস্করানন্দ মোটা হাতানোর লোভে বঙ্গ লক্ষ্মীর টিকিট কেটে খবরের কাগজে নম্বর মেলায়। হঠাৎ করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে ভাস্কর। লীলাবতী যুক্তি নির্ভর, তার কাছে বুজরুকির কোনো আশ্রয় নেই।

'শিকড়ের সন্ধানে' গল্প সংকলনের গল্প 'অবন্তির অ'। অবন্তী বর্ণমালা

খুঁজতে গিয়ে নিজের নামটাতে ফিরে আসে। তার নাম অবন্তীদাস রায়। এই নামটি পছন্দসই হয়নি। তাই তার নামটি নিয়ে খুবই চিন্তিত। তার বন্ধু শঙ্কর বলেছিল যে, তার রায় টাইটেলটা পেয়েছে পার্টিশনের পর। শংকর অবন্তীকে বুঝিয়ে বলেছিল সাইকি কনসালট্ করাতে। শংকরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ ঘটে। এখন সেই বন্ধুর জন্য অবন্তীর মন আকুল হয়ে পড়েছে। তাই অবন্তী মনরোগ সম্পর্কে ভাবে— ''অনেকের ভিতরেই তো এই রোগের ভাইরাস রয়েছে। গোটা পৃথিবীটা তো তাহলে এক গিজগিজানো মনরোগের জিবানু পিণ্ড এবং এইভাবে অন্যদের সাথে অবন্তী নিজের পার্থক্যও খুঁজে বের করে, অন্যদের হয়তো রোগবোধই নেই বা ওর মতো প্রকাশ্য নয়। ভেতরে সব চেপে রেখে সুস্থ দেখাতে চায়।''[১৩] অবন্তী এখন জেনেছে যে কাউকে ভালোবাসা বা না বাসা মুখ্যত একটা মানসিক বিলাস। তাই যে লালু নামে এক ছিঁচকে চোরকেও ভালোবেসেছে। আর অন্যদিকে স্কুলের হেড স্যার হাঁড়ি মুখো লোকটাকে ভালো বাসতে পারছেন না।

অবন্তীর বর্ণমালায় রোগটার পূর্বাভাস গতকাল রাত্রে পেয়েছিল। ঠিক যেন রোগ আসার পূর্বে গা ম্যাচ ম্যাচ করে বুক টিপ টিপ করে সেই রকম। শিলং রোড দিয়ে হাঁট ছিল— অনেক ভাবনা মাথায় নিয়ে। সুখি সুখি পায়রা পাখিগুলো পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল— আর তা তিনি দেখেছিলেন। তখন তিনি অনেকক্ষণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন। এক রাতেই নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করতে লাগলেন। তাই ভোর বেলায় নিজের বিরোধিতার দর্পণে নিজে দাঁড় করান। নিজের অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার কথাই ভাবেন। অবন্তী একটি ব্ল্যাক বোর্ডে ব্যস্ত ছিল এক দুরূহ অ্যালজাবরা করতে ছিল, তখন পেছনের ব্যাঞ্চ থেকে বিদঘুটে হাসির আওয়াজ এসেছিল এবং সেই হাসির মুখটা দেখা গিয়েছিল

পিযূষের। তাই ডাস্টার ছুড়ে দিল তার দিকে। এই নিয়ে ছাত্র ও অভিভাবকদের কত হইচই, ধর্মঘট, অবশেষে হেড স্যারই তা সামলে ছিল। তাকে পীযূষের বাড়িতে যেতে বলে ছিল কিন্তু অবন্তী যাননি। কারণ সে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাবে। ছোট্ট একটি ছাত্রের কাছে হেরে যাওয়া মানে মান সম্মান সব হারানো। তাই দেখা যায় অবন্তী সম্মান বোধ বজায় রাখার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ ছিলেন।

শিক্ষক অবন্তী হেড স্যারের বাড়ির দিকে যায় এবং নিজের ভুলের জন্য দুঃখিতও হয়। সে ভাবে নিজের অযোগ্যতায় অন্যের যোগ্যতাকে ঈর্ষা করা ছাড়া কিছুই নয়। সে ভাবে হেড স্যার হতে না পারার আক্রোশ। নিজের সব অন্যায় ভিত্তিহীন বলে ক্ষমা চায় স্যারের কাছে এই বলে— ''স্যার! স্যার অনেক অন্যায় আপনার কাছে করে ফেলেছি স্যার, কিন্তু সবই না বুঝে করেছি স্যার। মাঝখানে একটা যুক্তি গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করে সে। সত্যি খুব সরমে মরে যাচ্ছি স্যার, আমার যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে যাচ্ছে স্যার, আমি বড় অন্যায় করেছি স্যার, এর জন্যে দায়ী কে এখনও জানি না স্যার, আমি যে কতবার আপনার অকারণ গাম্ভীর্যকে আর কতবার নিজের উন্নাসিকতাকে দায়ী করেছি স্যার, তাই বলেছি ক্ষমা করে দিন।''[১৪]

একদিন অবন্তী নানা চিন্তা করতে করতে রাস্তায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে ভুবন তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে যত্ন করে। কিন্তু অবন্তীর মনে সন্দেহ হয় কেন তাকে ভালোবাসে বা যত্ন করে। কিন্তু পরক্ষণেই অবন্তী নিজেকেই প্রশ্ন করে— ''ছিঃ কথাটা ভাবতেই কেমন বিচ্ছিরি লাগছে অবন্তীর। শালার মনটা এমন হয়েছে না, কোন ব্যাপারকেই আজ পর্যন্ত নিঃস্বার্থ ভালোবাসাতো কোথাও দেখেনি, নিজের জীবনে তো নয়ই বাইরে কোথাও কেউ কাউকে বাসতে দেখেনি, তাই খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে আবন্তী। ভুবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় খুব আকুল হয়ে

পড়ে। এক মনে শুধু ভুবনের কথা ভাবতে থাকে, — ভুবন ভুবন আর ভালবাসা, ওর ভালো। তাই ভুবনকে খুব অন্তরঙ্গ ভাবে জিজ্ঞেস করে, তুই এখন কি পড়িস রে?"[১৫]

'বাজার' গল্পটিতে হাইলাকান্দি জেলার একমাত্র রবিবারের বাজার হল করমুজি বাজার। হাইলাকান্দি ও লালা শহরের মাঝখানে করমুজি বাজার। বাজারের দিন তেপথি মোড়ে বাস দাড়ায় তাতে প্যাসেঞ্জার বেশি হয়। আর মনি কাকার চায়ের দোকানে ড্রাইভার এক গ্লাস চাও খায় বিনা পয়সায়, তাতেও কিছুটা সময় দেরি করে। বাজারের দিনে বাসে প্রচুর ভির হয়। প্যাসেঞ্জার উঠেই বলে— "ছাড়তা না নিবা।" প্যাসেঞ্জারে প্যাসেঞ্জার চাপাচাপি আর গায়ে গন্ধ মানুষের ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। কেউ যদি সেই সময় জিনিসপত্র নিয়ে উঠে অন্য প্যাসেঞ্জারের গালি শুনতে হয় ও তার সহযোগীরা তাকে সহানুভূতি দেখায়। লেখক এই বর্ণনাটি দিয়েছেন শুধু করমুজি বাজারের দিনে নয় প্রত্যেক বাজারের দিনে বাস যাত্রীদের এই অবস্থা হয়। আর এই বাজারে আসে আলগাপুর, সরসপুর, মোহনপুর, কুচিলা, বানবাহার, আইরংমারা থেকে মানুষজন দল বেঁধে আসে বাজারে ঘুরতে। আর লালা, রাজ্যেশ্বরপুর ও হাইলাকান্দির মধ্যবিত্তরাও নানা যানবাহনে চড়ে এই বাজারে আসে। আর এই বাজারের পাশে চা বাগানের শ্রমিকরা শনিবারে তলব পায়। তাই রবিবারের বাজার করতে আসে সবাই, কিছু কেনাকাটা করতে। চা বাগানের এরিয়ার পরিবেশে হাড়িয়া খাওয়ার প্রচলন আছে। এই বাজারে বিক্রি হতো— "আঁটি বাধা লাইশাক, ধনিয়া পাতা, আলু পাতা, পালং শাখ, হেলাইঞ্চার আঁটি, ভাগা করে ঠুনমানকুনির পাতা। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে অনেকেই কিনত বিরইন চাল ও কচি বাঁশের চুঙা।"[১৬]

মহাজন একটি সাইকেল হারিয়েছে সেই সাইকেলর খোঁজ চলছে। নানা জনের সাইকেল দেখলেই জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাই এখন আর সাইকেল নিয়ে

ভাবতে চায় না। তিনি লক্ষ করেছেন এই বাজারের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। তাই নেপালকে জিজ্ঞাসা করেন এখানে মাছ বিক্রি হয় কি না। তাকে নেপাল জানায়— ''অই ডালাত করি ইচা পুটিমকার ভাগা লইয়া বই রইছে দুই একজন।'' করমুজির বাজারে ছাগল বিক্রি হয় প্রচুর, দাম সস্তা। বাজারে ঢুকে ছাগল পছন্দ করে। ধনুমিয়া মহাজনের হাত থেকে কালো রঙের ছাগলটি নিয়ে বলে— ''স্যার বাড়ি পৌঁছাই দিয়া আইয়ার।'' পরক্ষণেই মহাজন জানায়, ''আরে কিতা মাতো বা। দরদাম করলাম না, কিনলাম না, বাড়িত দিয়া আইতায় কিতা! আর তুমি যাইবা এক দিকে আমি যাইমু উল্টা।''[১৭] এখানে ধনুমিয়া মহাজনের কাজ করে দিতে প্রস্তুত কারণ সমাজের যে নিচু পদস্ত মানুষ সব সময় চায় উচ্চ পদস্ত মানুষের কাজ করতে প্রত্যেক সমাজে এই রকম মানুষ আমাদের নজরে আসে।

এক জায়গায় অনেকগুলি সাইকেল দেখে চক্রধর দাশ বলে— ''পাওয়া যাইত না কেনে, অত সাইকেল ইখানে, একটা উঠাইলও বাবুল।''[১৮] চক্রধর দাশ প্রচণ্ড লোভী মানুষ এবং হিংস্র প্রকৃতির। সাইকেলটি মহাজন নন্দীর চায়ের দোকানে রেখে এসেছিল তা দিতে আসে কালা। কালা ছিল নির্দোষ তাকে থানা নিয়ে যাওয়ার জন্য চক্রধর দাশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কারণ তার মত ব্যক্তি ন্যায়- অন্যায়ের ধার ধারেন না, তার মতো ব্যক্তি পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বে যারা আছে তারা নির্দোষকেই দোষী বানায়। ধূর্ত পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

'পাথর প্রতিমা' গল্পে কাকাবাবু মালিক হলেও সে খুনের আসামী। পুলিশ তার একটি পা ভেঙে দিয়েছিল। সে সব ভালো ভালো কথা বলেন। তিনি বলে— ''একদিন সব হবে। মানুষের সুখ হবে। যারা ঠকিয়েছে সবার শাস্তি হবে। উঁচু জাত নীচু জাতের ফারাক থাকবে না, সব সমান হবে। তবে আনপড় থাকলে বলবে না।''[১৯] তিনি নতুন আশার আলো দেখেন। তিনি পড়াশুনা করে জেন্টালম্যান হতে চেয়েছেন। দেশের মধ্যে সাক্ষরতার অভিযান শুরু হতে দেখেন এবং তিনি

ঘোষণা করেন— ''বিদ্যাসাগরের দেশ নিরক্ষরতার করব শেষ।'' বিদ্যাসাগরের আমলে ছেলে ও মেয়েদের পড়াশুনার অধিকার এনে দেন। তাই পনেরো জন হোটেলকর্মীর সংসারে দেখা যায় একমাত্র লেখাপড়া জানা সেপাই হল জয়াদি। তবে লেখাপড়া করার সখ আছে বাতাসীরও। সে নকল বাপ কাকাবাবুকে বলে— ''কর্পোরেট করে দাও। হোটেল চালাব আমরা।'' একথা শুনে কাকাবাবুর ভাবনা হয় বাতাসী দুঃখে আছে কিনা। তিনি এও সিদ্ধান্ত করেন যে তাকে উইল করে দিয়ে যাবেন। বাতাসীর বয়স একুশ তবে সে ঝোনা নারকেল। সে নাচ, গান ও ডাক্তারি জানে। সব কিছু জেনেই কাকাবাবুর পান্থশালায় তার মাথা গোঁজার নিশ্চিত ঠাই। জীবনের নিত্য প্রয়োজন হল অশন, বসন ও বাসস্থান। বাতাসীকে সমাজের উচুথাকের ও মাঝেরথাকের পুরুষরা খাদ্য রূপে ব্যবহার করে। বাতাসী হয়ে উঠেছে মানুষের ভোগ্যবস্তু। বাতাসীর মা কাকাবাবুকে বাপ ডাকতে শিখিয়েছিল তার কাছে বাতাসী নিরাপদ নয়।

বাতাসীর মা হওয়ার বাসনা ছিল। সে গৃহিনী হতে চেয়েছিল, তাই গৃহস্বামীও দুর্যোধনকে সে স্বামী হিসাবে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাতাসীকে সে অস্বীকার করলো।

ষাটের ও সত্তরের দশক থেকে নানা বিপ্রতীপকে উপলব্ধি করেছেন কথাকার রণবীর পুরকায়স্থ। তখন থেকেই শুরু হয়েছে বিজ্ঞানের প্রসার ও নারীর অধিকারের স্বীকৃতি। এমন কি সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিশেষ গুরুত্ব রাখা হয়েছিল। কিন্তু এইসব বিষয় তলে পড়ে উঠে এসেছে জাতি বিদ্বেষ, হিংসা ও একনায়কতন্ত্র শাসন। এর ফলে সমস্ত মানুষ এই অরাজকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। কিন্তু রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ চুপ থাকেনি তারাও কঠোর শাসন শুরু করে। তখন সাধারণ মানুষেরা টিকে থাকার সংগ্রাম করেছিল। সমাজের এই বিকৃত রূপটি তুলে ধরেছেন লেখক। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য উল্লেখ

করেছেন— ''উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাঁরা লেখেন, তাঁদের মৌল চালিকাশক্তি হল আত্মপরিচয় অর্জনের প্রয়াস ও সেই প্রয়াসের সংকট মোকাবিলার ধারাবাহিক যুদ্ধ। হ্যাঁ, লেখা এঁদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধ, প্রতিটি পলে অনুপলে। শুধুমাত্র ঐ প্রয়াসকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য সাহিত্য-শ্রমিকদের কতখানি আত্মক্ষয়ী অধ্যবসায় অটুট রাখতে হয়, তা অনুকূল স্রোতে নৌকা বেয়ে যাওয়া প্রথম ভুবনের পক্ষে চিন্তারও অগোচর। যে সমাজের অন্তঃস্পন্দন তুলে ধরার জন্যে অনমনীয় লড়াই করে যান তৃতীয় ভুবনের গল্পকারেরা, সেই সমাজেরই নির্লিপ্ত, বিদ্রূপ ও প্রতি-আক্রমণ তাঁদের সইতে হয় বিনির্মাণবাদে। তবু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও, উত্তরপূর্বে বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাস নেহাত ছোট নয়। উপভাষা-অঞ্চলের নিজস্ব তাগিদ মনে রেখেই সাহিত্যের উপযোগী নান্দনিক ভাষা তৈরি করে নিতে লেখকেরা কম পরিশ্রম করেননি।''[২০] বরাক উপত্যকার লেখক রণবীর পুরকায়স্থ, মলয়কান্তি দে, শেখর দাশ ও অরিজিৎ চৌধুরী এদের গল্পের মধ্যে আছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষয়। রণবীর পুরকায়স্থ, সুব্রতকুমার রায়, অমিতাভ দেব চৌধুরী ও সৌমিত্র বৈশ্য— এঁরা নান্দনিক আধুনিকতার প্রতি বেশি মনোযোগী। গল্পের প্রাকরণিক জটিলতা এঁদের গল্পবয়ন বেশি করে ধরা পড়েছে, যেমন— সৌমিত্র বৈশ্যের 'নিখিলেশদের বেঁচে থাকা', অমিতাভ দেব চৌধুরীর 'প্রসিদ্ধ রক্ত', সুব্রতকুমার রায়ের 'আয়না', রণবীর পুরকায়স্থের 'মিনির হাসি', 'রঞ্জন আসছে', 'তরমুজ'।

অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমালোচক প্রথম বাংলা ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলায় প্রথম গল্প হিসেবে ধরা হয়েছে আনুমানিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্পটি। এটি ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে ছোটগল্প সার্থকতা পায়। তাঁর প্রথম সার্থক ছোটগল্প 'ঘাটের কথা' এটি ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়।

সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে ছোট গল্পের সংজ্ঞা দিয়েছেন— ''ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে এক-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।''[২১] রণবীর পুরকায়স্থ ছোটগল্প বলতে বুঝিয়েছেন, ছোটগল্পের মধ্যে থাকবে সংঘাত। তিনি যে সংগ্রামের কথা বলেছেন তা আসলে আধুনিক যুগেও জীবনের জটিলতাকে বুঝিয়েছেন। আর এই বিষয়েরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন ছোটগল্পে। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য 'পড়ুয়ার ছোটগল্প' গ্রন্থে 'প্রাক্‌কথন' অংশে বলেছেন, ''বাচনের শিল্পকৃতিদের মধ্যে কবিতা ও ছোটগল্প সবচেয়ে রহস্যময়। যদিও এই নিরিখে কবিতা অনেকখানি এগিয়ে, তবু অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ও নিবিড়তা সঞ্চারিত করার সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পকে যেহেতু কথকতার ন্যূনতম দাবিও মেটাতে হয়, তার অনন্যতা অস্বীকার করা যায় না কখনও। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরীরা ছোটগল্পকে কত নতুন নতুন পথে সঞ্চালিত করেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই বাংলা ছোটগল্প আপন স্বাতন্ত্র্য খুঁজে নেওয়ার তাগিদে বিচিত্রগামী হতে শুরু করেছিল। অন্তত এদিক দিয়ে ছোটগল্প নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতার সমৃদ্ধি ও উচ্চাবচ্চতার সার্থক প্রতিস্পর্ধী।''[২২] বরাক উপত্যকার কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থ তাঁর ছোটগল্পে বরাক অঞ্চলের উপভাষা ও বিভাষাকে স্থান দিয়েছেন। প্রাবন্ধিক ও সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন ''অজস্র উপভাষা ও বিভাষা যে মূল ভাষার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের প্রমাণ।''[২৩]

কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থের সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাচক্র, সামাজিক ঘটনা ও শাসকদলের পালাবদল, অস্থিরতার মগ্নচৈতন্যতে আলোড়ন তুলেছে। এক কথায় বলা যায় তাঁর মনে একটা ছাপও পড়েছে। তাঁর রচনায় সেই ছাপ কোথাও কোথাও প্রকট বা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাঁর লেখার মার্জিনে, ফাঁকা সাদা

জায়গায় লুকিয়ে আছে নানা প্রশ্ন, ইঙ্গিত এবং দ্বন্দ্বের ইশারা। আমাদের প্রয়াস লেখকের নির্মাণের অভ্যন্তরে ঢুকে সেই ইঙ্গিত শনাক্তকরণ করা। তিনি গল্পের মধ্যে নাটকের আখ্যান কৌশল ব্যবহার করেছেন। তার ফলে গল্পের বাক্যনির্মাণ ও বাক্য সজ্জা বৃদ্ধি পায়। তিনি ব্যাঙ্কের চাকরি করতেন সেই সূত্রে বার বার বদলি হয়েছেন আর এই বদলির ফলেই জীবনে সঞ্চারিত হল গতি ও চলিষ্ণুতা। তিনি সমাজ জীবন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংকট নিয়ে লিখেছেন তাঁর রচনায়।

সিলেট জেলাকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে। অবিভক্ত বাংলার ভৌগোলিক সীমা থেকে সিলেটকে স্থানচ্যুতি করায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছিলেন—

> ‘‘মমতাবিহীন কালস্রোতে
> বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে
> নির্বাসিতা তুমি
> সুন্দরী শ্রীভূমি।’’

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বরাক উপত্যকার মানুষের জীবনে এক বিচ্ছেদের ছাপ রেখে গিয়েছে। সিলেট হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান আর সিলেটের মানুষ আবার উদ্বাস্তু হয়ে ভারতেই ফিরতে হলো। ভৌগোলিক সীমারেখা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সিলেটিদের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। তাই সিলেটবাসীর এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। দেশ ভাগ কাছাড়ের বাঙালির কাছে এক রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

কথাসাহিত্যিক রণবীর পুরকায়স্থ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সমকালের প্রেক্ষাপটে

লেখা, তা সমকালের হলেও সমকালকে অতিক্রম করে যায়। তাঁর লেখা বিশেষ কালের বলে ধরা হয়, তা হয়ে পড়ে নিত্যকালের। তাঁর লেখায় কোনো সময়ের সঙ্কীর্ণ সমাজ বৈশিষ্ট্য ফুলে উঠে না, তার লেখায় ফুটে উঠে সব সময়ের ও সকল সমাজের বৈশিষ্ট্য।

তথ্যসূত্র :

১. ‘মিনির হাসি’, পৃঃ ৯

২. ‘আসমান জমিন কথা’, পৃঃ ১৬৮

৩. তদেব, পৃঃ ১৭৯

৪. তদেব, পৃঃ ১৭৯

৫. তদেব, পৃঃ ১৮১

৬. তদেব, পৃঃ ১৬৯

৭. বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ, পৃঃ ১৯৯

৮. নৌকাডুবি, পৃঃ ১৫৪

৯. তদেব, পৃঃ ১৫৪

১০. তদেব, পৃঃ ১৫৪

১১. ‘সাধাসিধে’, পৃঃ ১৫৬

১২. ‘খোঁজে লীলাবতী’, পৃঃ ৬২

১৩. ‘অবন্তীর অ’, পৃঃ ১২২

১৪. তদেব, পৃঃ ১২৫

১৫. তদেব, পৃঃ ১২৬

১৬. ‘বাজার’, পৃঃ ১১

১৭. তদেব, পৃঃ ১৪

১৮. তদেব, পৃঃ ১৮

১৯. ‘পাথর প্রতিমা’, পৃঃ ১০৯

২০. ‘ছোটগল্পের প্রতিবেদন’, তপোধীর ভট্টাচার্য, পৃঃ ২০২

২১. ‘ছোটগল্পের বিষয়-আশয়’, সুমিতা চক্রবর্তী, পৃঃ ১২

২২. পড়ুয়ার ছোটগল্প, তপোধীর ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭

২৩. তদেব, পৃঃ ১৭৮